হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৯, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

''যদি তুমি অন্য কোন দেশে গিয়ে মুসলমানদিগকে বা অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বলো, দেখিবে তাহারা কি রূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটি-কেও তাহারা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে''

—স্বামী বিবেকানন্দ।

রামপুরহাট ও মল্লারপুরে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন

শোভাযাত্রা আক্রান্ত ঃ হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানি

আগে থেকেই প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তবু প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তাই পূর্ব পরিকল্পনা মতই বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের মহাজন পট্টিতে মুসলমানরা দুর্গাপূজার বিসর্জনের শোভাযাত্রা আক্রমণ করল। প্রতি বছরই দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জনের শোভাযাত্রায় মুসলিমরা কিছু না কিছু উৎপাত করে। এবার তাদের প্রস্তুতি বড় রকমের ছিল। তাই বিজয়া দশমীর দিন ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রামপুরহাট শহরের ১০টি ক্লাবের দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে যখন একসঙ্গে বিসর্জনের শোভাযাত্রা বের হয়েছিল, তখন রামপুরহাট সংলগ্ন বগটুই গ্রামের মুসলিম যুবকরা তৈরী হয়েই ছিল। তারা ঐ শোভাযাত্রার মধ্যে ঢুকে পড়ে ও নাচার অজুহাতে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী হিন্দু মেয়েদের প্রতি অঙ্গভঙ্গী করা, হাত ধরে টানা ও শ্লীলতাহানি শুরু করে দেয়। হিন্দু ছেলেরা তার প্রতিবাদ করলেই প্রস্তুতিমত শুরু হয়ে যায় শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ। একজন হিন্দু যুবকের মাথা ফেটে যায়। তখন হিন্দুরা ৪টি মুসলিম ছেলেকে হাতেনাতে ধরে ফেলে ও পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক আশীষ ব্যানার্জী। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী হিন্দুরা দেখে যে আশীষবাবু পুলিশকে চাপ দিচ্ছেন ঐ মুসলিম দুষ্কৃতকারীদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। আশীষবাবুর কথায় ঐ দুষ্কৃতিদের পুলিশ ছেড়ে দেয় এই দেখে হিন্দুরা খেপে যায়। তারপর শোভাযাত্রা রামপুরহাট পাঁচমাথার মোড়ে পৌঁছলে আশীষবাবুর উস্কানিতে ও এস.ডি.পি.ও-র আদেশে পুলিশ হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড লাঠি চার্জ করে। তখন হিন্দুরা আশীষবাবুর উপর চড়াও হয়। আশীষবাবুর বাড়ীতে তৃণমূলের অফিসও ভাঙচুর হয় ক্রুদ্ধ জনতার ক্ষোভে। জনতা পুলিশের একটি ক্যাম্পও ভেঙে দেয়। হিন্দু ও মুসলিম দুপক্ষ থেকে প্রচুর পাথর ও বোমাবৃষ্টি হয়। পুলিশ সমেত অনেকে আহত হয়। গণ্ডগোল থামাতে পুলিশ লাঠি চার্জ ও টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ে। তাতেও অবস্থা নিয়ন্ত্রণে না আসায় শূন্যে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালাতে হয়। বিসর্জনের শোভাযাত্রা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিবাদে হিন্দুরা প্রতিমাগুলিকে রাস্তার উপর রেখে দিয়ে সারা রাত থানায় বিক্ষোভ দেখায়। রাত্রি আড়াইটার সময় পুলিশ কিছু লোককে দিয়ে জোর করে প্রতিমাগুলির সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়ভাবে একটা পুকুরে বিসর্জন করিয়ে দেয়। এইভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় বিধিতে অবৈধ ভাবে পুলিশের হস্তক্ষেপে হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। পরের দিন মঙ্গলবারও শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। প্রশাসন সারা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করেছে। তৃণমূলের আক্রান্ত বিধায়ক আশীষ ব্যানার্জী অভিযোগ করেন যে সিপিএম ও বিজেপি-র লোকেরা একত্রে জোট বেঁধে গণ্ডগোল লাগিয়েছে। তিনি বিজেপি কাউন্সিলর শুভাশীষ চৌধুরীর নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রামপুরহাট পৌরসভার নির্বাচনের পর এলাকার দাউদ ইব্রাহিম নামে পরিচিত কংগ্রেসের সৈয়দ সিরাজ (জিম্মি) কে আটকাতে বিজেপি-র কাউন্সিলররা সিপিএম-কে সমর্থন করে বোর্ড গঠন করতে সাহায্য করেন। পরবর্তীকালে কয়েকজন কাউন্সিলরকে কিনে নিয়ে ঐ জিম্মিই পৌরসভার চেয়ারম্যান পদটি দখল করেন।

মল্লারপুরের ঘটনা ঃ রামপুরহাটের পাশেই বর্ধিষ্ণু গ্রাম মল্লারপুর। ঐ গ্রামের মেঘদূত ক্লাবের দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা বের হয়েছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যায়। যখন ঐ শোভাযাত্রা নিকটবর্তী রুকুনপুর গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন কিছু মুসলিম দুষ্কৃতকারী শোভাযাত্রা আক্রমণ করে ও বোমা ছোঁড়ে। মেঘদূত ক্লাবের সদস্যরা এর প্রতিবাদ করলে রুকুনপুর গ্রাম থেকে আরও প্রচুর সংখ্যায় মুসলিম এসে ঐ ক্লাবঘর আক্রমণ করে ও ক্লাবের সদস্যদের প্রচণ্ড মারধোর করে। চারজন সদস্য গুরুতর আহত হয়। তাদেরকে রামপুরহাট হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। বীরভূম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফরহাত আব্বাস বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু কোন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা হয় না। হিন্দুরা এই পুলিশ অফিসারের আচরণকে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করে।

এই ঘটনার ফলে সেদিন তিনটি ক্লাবের দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া যায় না। পরে পুলিশের নির্দেশে শুক্রবার সকালে ঐ তিনটি ক্লাবের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

পুলিশের এইরকম আচরণে হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। তারা শুক্রবার দুপুর থেকেই ৬০ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এই সড়কটি দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের সংযোগকারী রাস্তা। ক্রুদ্ধ হিন্দুরা বিরাট সংখ্যায় এসে তিন স্থানে ঐ সড়ক অবরোধ করে। পুলিশ এসে অবরোধ হটাতে শিশু ও মহিলাসহ সকলের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে। তবুও জনতা অবরোধ সরায় না। হাজার হাজার গাড়ি, ট্রাক রাস্তায় আটকে পড়ে। তখন সন্ধ্যায় জেলার এস.পি. রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী এসে পূজা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর অনুরোধে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা অবরোধ চলার পর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু। ২০০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে এই মহকুমায় হিন্দুর সংখ্যা ৪৮.৯ শতাংশ, মুসলিম ৫১.১ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় বর্তমানে মুসলিম সংখ্যা প্রায় ৫৫ শতাংশ হবে। এই মহকুমায় নলহাটি ও মুরারই থানার অবস্থা আরও ভয়াবহ। বিহারী মুসলমান কুখ্যাত কলিমুদ্দিন শামস্ তাঁর খিদিরপুর সিটটা নিজের ছেলের জন্য ছেড়ে দিয়ে নলহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০১ জনগণনা অনুসারে নলহাটি ও মুরারই থানায় মুসলিমদের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৪ শতাংশ এবং ৬৫.৫ শতাংশ।

খড়দহে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙল দুষ্কৃতিরা

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার খড়দহে মহাষ্টমীর ভোর রাতে একটি ক্লাবের দুর্গাপূজায় ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। খড়দহের পি.কে.বিশ্বাস রোডের 'বয়েজ ক্লাবের' দুর্গাপূজা অনেকদিনের পুরানো পূজা। বিশাল প্যাণ্ডেলের এই পূজা দেখতে প্রতি বছরই হাজার হাজার জনতার ঢল নামে। এবছরও সপ্তমীর মধ্যরাত পর্যন্ত হাজার হাজার দর্শনার্থী এই ঠাকুর দেখেন। ফলে ক্লাবের কর্মকর্তারা আলাদা করে প্যাণ্ডেল বা প্রতিমা পাহারা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা রাখেন নি। কিছু দুষ্কৃতকারী মহাষ্টমীর ভোররাতে এসে প্রতিমার কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মূর্তিগুলি ভেঙে দেয়। শুধু দেবী দুর্গার প্রতিমাটি অক্ষত থাকে। অন্যসব মূর্তিগুলির কোনটির হাত ভাঙা, পা ভাঙা, কোনটির বা গলা কাটা। অষ্টমীর সকালে উদ্যোক্তারা এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। এমনকি পূজামণ্ডপে রাম, লক্ষ্মণ ও বীর হনুমানের ছবিও ছিঁড়ে ফেলা হয়।

খড়দহের পি.কে.বিশ্বাস রোড এলাকাটি মিশ্র ধর্মীয় জনবসতি। এখানে বহু বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী রিক্সা চালানোর কাজ করে। মসজিদে ও মাদ্রাসায় ছোটবেলা থেকেই তাদের মনে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি করা হয়। স্থানীয় হিন্দুরা সন্দেহ করেন এই মূর্তি ভাঙা তাদেরই কাজ।

ভাঙা ও খণ্ডিত মূর্তিতে পূজা হওয়া সম্ভব নয় বলে ক্লাবের কর্মকর্তারা তখন অষ্টমী, নবমী ও দশমীর পূজা ঘটে করেন। তবু তাঁরা মূর্তি ভঙ্গকারী দুষ্কৃতিদের খোঁজার চেষ্টা করেন না। আর স্থানীয় হিন্দুরা এই ঘটনায় দুঃখিত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন। খড়দহ পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রী অশোককুমার বাল্মীকিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এলাকায় এই ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা থাকলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য ঃ

এইসব ক্লাবের পূজা যারা করেন তাঁরা হিন্দু নামের কলঙ্ক। ধর্ম ও পূজার প্রতি এদের কোন নিষ্ঠা ও ভক্তি নেই। শুধু হুল্লোড় করা, ফূর্তি করা ও পয়সা কামানোর জন্য এরা পুজোর নামে ধর্মকে অপব্যবহার করেন। পূজার পবিত্রতা রক্ষার কোন দায়িত্ব এরা পালন করেন না। যদি এরকম কোন ঘটনা খ্রীষ্টান বা মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ঘটত, তাহলে তার পরিণাম কি হত সবাই জানে। ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে হজরত মহম্মদের চুল চুরি হওয়ার ঘটনায় গোটা ভারতব্যাপী মুসলমানরা দাঙ্গা করেছিল। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানেও হিন্দুদের উপর চরম অত্যাচার করা হয়েছিল। খড়দহের এই বয়েজ ক্লাবের পূজা সংগঠকদের অনেকেরই মা-বাবারা হয়ত সেই দাঙ্গার সময়ই সাধের জন্মভূমি ছেড়ে রিফিউজি

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

হোটরে দুর্গাপূজা উদ্বোধন করলেন তপন ঘোষ

গত সংখ্যায় সংবাদ ছিল মগরাহাটের ২৫ বছরের দুর্গাপূজা বন্ধ হওয়ার মুখে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট থানার হোটর গ্রামে 'দক্ষিণ মর্যাদা সার্বজনীন দুর্গাপূজা' গত ২৫ বছরের। ঐ গ্রামে পুজো উদ্যোক্তা শোভারাণী এ্যাথলেটিক ক্লাব। সেই ক্লাবের জায়গা এবং তার পাশের দেবীর থানের জায়গা যেখানে পুজো হয়। মুসলিমদের দাবী ওই জায়গা তাদের কবরস্থান, তাই পুজো করা চলবে না। অনেক সংঘর্ষের পর উচ্চ আদালত থেকে আদেশ নিয়েই পূজা হয়। পূজা উদ্যোক্তারা তাদের এই পুজো উদ্বোধন করার জন্য হিন্দু সংহতির নেতৃবৃন্দদের আমন্ত্রণ

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

আমাদের কথা

অপহরণের আশংকায় বঙ্গজননী

কিছু কি দেখতে বা শুনতে পাচ্ছেন? পাচ্ছেন না। তবে শুনুন। গত দুই দশক ধরে ইসলামি জঙ্গী সন্ত্রাসে রক্তের হোলিখেলার মাধ্যমে ভারতের এবং বিশেষ করে আমাদের বাংলার মাটিতে আবার এসেছে দেশভাগের সময়কার সেই ধ্বনি ও কর্মসূচী 'হাঁসকে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান'। ভারতের বিভিন্ন শহরে, মন্দিরে, জনবহুল ট্রেনে ও লোকালয়ে এমনকি এই সেদিন মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে তিনদিন ধরে ইসলামি জঙ্গী সন্ত্রাস ঐ ধ্বনিরই কর্মসূচী। এইসব তবু বোঝা যায়। কিন্তু বাংলার মাটিতে ঐ ধ্বনি রূপায়ণে ভিন্ন কায়দায় যে মুসলিম বর্বর ও নিষ্ঠুর অত্যাচার ঘটে চলেছে তার কথা টিভি বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। তাই যেখানে যেখানে মুসলিম অত্যাচার নেমে এসেছে সেখানেই আজ উঠছে হিন্দু আর্তনাদ। আর সে আর্তনাদ চাপা দিতে ঘটা করে সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত দক্ষ অভিনেতার মত এ রাজ্যের রাজনৈতিক দাদা/দিদিরা ইফ্‌তারে নামাজ পড়ে মুসলিম দরদী সাজছে এবং পরক্ষণেই দুর্গাপূজার উদ্বোধন করে হিন্দু জনতাকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে। মুসলিম মন পেতে গান্ধীজিও এ কাজ করেছিলেন। হিন্দু মন্দিরে কোরান ও গীতা পাঠের পর মসজিদে গীতা পাঠ করার অপরাধে তাঁকে প্রাণ বাঁচাতে তিনদিন দিল্লীতে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু কেন? হাঁটুর উপর কাপড় পরা গান্ধীজির সাফল্যের খতিয়ান তো কম নয়। সারা ভারতের মানুষকে এক ডাকে জড়ো করতে পারতেন তিনি। তবুও এ কাজে তিনি সাফল্য পেলেন না। কারণ তাঁর অহংকার। মুসলিম জনতাকে ভারতবর্ষের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনবই—এই ছিল তাঁর অহংকার। এই অহংকারে তিনি খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা হয়েছিলেন, এমনকি তাঁর ডান ও বামপাশে মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলিকে বসিয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবাসী কি দেখল? দেখল খিলাফৎ আন্দোলনের নেতাকে প্রাণ বাঁচাতে তিনদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়। আর পাকিস্তানের ডাক শুনতে পেয়েই আলি ভ্রাতৃদ্বয় গান্ধীজিকে ছেড়ে চলে গিয়ে বলে, 'একজন দাগী অপরাধী মুসলিমের চেয়েও গান্ধীজি নিকৃষ্ট'।

ইসলামি জঙ্গী সন্ত্রাসে নিরপরাধ হাজার হাজার ভারতবাসীর চাপ চাপ রক্ত দেখেও ভারতের এবং বিশেষ করে এই বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের এসেছে গান্ধীজির মত অহংকার। তা আসুক। কিন্তু তার জন্য যে প্রক্রিয়া তারা শুরু করেছে তার মূল্যায়ন আজ অত্যন্ত জরুরী। দেশভাগের সময় কাঁদতে কাঁদতে পাকিস্তান চলে যাওয়া সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খান ভারতের সপ্তম প্রজাতন্ত্র দিবসে এসেছিলেন ভারতে। পরের দিন কুরুক্ষেত্রে হিন্দু রমণীরা তাঁকে নিজেদের মাথার চুল ভিজিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিয়ে তাদের সন্তানদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে বলেছিল যেন তাদের সন্তানেরা গফুর খানের মত হয়। এদেশে এখন মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে খান সাহেবেরা ব্রাত্য। ব্রাত্য এস.ওয়াজেদ আলিরা যাঁরা বৃদ্ধ পিতা ও পরবর্তীকালে পুত্রের পরম্পরাগত রামায়ণ পাঠ শুনে বলতে চায় 'সেই Tradition সমানে চলেছে।' কোন কদর নেই বেগম রোকেয়ার মত তেজস্বী মুসলিম মহিলাদের যারা শ্বশুরের বিছানায় শুতে অথবা শুধুমাত্র 'ট্রাউজার্স' পরার অপরাধে লুবনা আহমেদের মত চল্লিশ ঘা বেত খাওয়ার শরিয়তি শাস্তিকে উদ্ধত ভঙ্গিতে অস্বীকার করে। মুসলিম জনতাকে ভারতের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে তাই আমাদের রাজনৈতিক দাদাদের বড় অবলম্বন সেইসব অর্ধশিক্ষিত মোল্লা মৌলবীরা যাদের ডাকে পার্ক সার্কাসে দাঙ্গা হয় বা একটি প্রবন্ধ ছাপার অভিযোগে কলকাতার স্টেটস্‌ম্যান অফিসে তিনদিন ধরে হামলা চালায় মৌলবাদী মুসলিম জনতা। ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছতে এই মুসলিম জনতাই উভয়ের হাতিয়ার।

সোরাবর্দীও ছিল আমাদের ভরসাস্থল। পাকিস্তানের দাবী আদায় করতে সেই 'লড়কে লেঙ্গে' সোরাবর্দীই হল কলকাতায় হিন্দু নিধন যজ্ঞের নায়ক। ভারতের মহাফেজখানায় সে সব তথ্য আজও আছে। মুসলিম সমাজের 'লড়কে লেঙ্গে'র দল সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভারতে জমি তৈরী করছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে ভারতের জন্য একজন জিন্নাকে আর বাংলার জন্য একজন সোরাবর্দীকে। যেদিন ওরা খুঁজে পাবে সেদিন নিদ্রিত বাংলার ঘুম ভাঙবে আর দেখবে '৪৭ সালে হাত, পা কেটে নিয়ে যাওয়া বঙ্গজননীর অবশিষ্ট দেহটিকেও ওরা অপহরণ করে ফেলেছে। সেই কার্যক্রমের মহড়া হিসাবে এ বছর মগরহাটে দুর্গাপূজা বন্ধ, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ভিটেমাটি ছেড়ে হিন্দুরা পালিয়ে আসছে, কোথাও মা কালীর হাত ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও হিন্দুর জমি জবরদস্তি দখল করে মসজিদ বানাবার প্রচেষ্টার সাথে গায়ের জোরে হিন্দু যুবতীদের তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটেই চলেছে। এ দাপট আজ এতটাই যে কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে স্কুলবাসে হিন্দু মেয়েদের পিছনে মোটরবাইকে ধাওয়া করে ড্রাইভারকে মেরে হিন্দু ছাত্রীদের তুলে নিয়ে যাওয়ার সাহস পর্যন্ত দেখাচ্ছে।

অপহরণের আশংকায় আজ বঙ্গজননীও কাঁদছে। সে অশ্রুমোচনে নেই তার রাজনৈতিক সন্তানেরা। বঙ্গজননী তাই তাকিয়ে আছে খান আব্দুল গফুর খান, এস. ওয়াজেদ আলি বা বেগম রোয়েরা মত তার দেশপ্রেমিক সন্তানদের দিকে, তাকিয়ে আছে মাতৃলাঞ্ছনার প্রতিকারে নির্ভীক, সাহসী তার সন্তানদের দিকে, তাকিয়ে আছে এ রাজ্যের বিদ্যারণ্য স্বামী, সমর্থ রামদাস বা পাগল ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ ও প্রণবানন্দ স্বামীর সন্তানদের দিকে। প্রশ্ন হল, মাকে রক্ষা করা যদি ধর্ম হয় তবে সে ধর্মপালনে বঙ্গজননীর এই সন্তানেরা কি এগিয়ে আসবে, নাকি জননীর শত লাঞ্ছনা দেখেও তারা 'রবে নীরবে'।

প্রথম পাতার শেষাংশ

খড়দহে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙল দুষ্কৃতিরা.....

হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন। তবু এই পুজো করা হিন্দুরা শিক্ষা নেবে না। নিজ ধর্মের দেবদেবীর পবিত্রতা রক্ষার কোন চেষ্টা করবে না। উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভণ্ডামি করবে। তারপর হুড়ো খেলে আবার পালাবে। সম্পূর্ণ খড়দহ-টিটাগড় অঞ্চলে আবার পাকিস্তানের পুনরাবৃত্তি হবে। তাই এইসব কাপুরুষদের পুজোয় কোনরকম সহযোগিতা করা উচিত নয়।

ভারতের ৬০ শতাংশ মুসলমান মৌলবাদী

মলয় কৃষ্ণ ধর (প্রাক্তন জয়েন্ট ডিরেক্টর, আই.বি.)

আমাদের সমস্যা অনেক। আমাদের প্রকৃত অবস্থান বা বাস্তব অবস্থা আরও জটিল। আমাদের উপলব্ধি আর বিশ্বাস এত হাল্কা ভাসা ভাসা যে আমাদের ত্রুটিপূর্ণ নীতিগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে করা কঠিন। তবু বাস্তবকে বিশ্লেষণ করলে যে ক্যান্সার রোগের দিকে নজর পড়ে তা হল—ইসলামী মৌলবাদের বৃদ্ধি, জেহাদী বিষে জর্জরিত হতে থাকা ভারতীয় মুসলিম মানস এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোবৃত্তির পুনরাগমন।

প্রথমেই স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, সকল মুসলমানই বিচ্ছিন্নতাকামী বা জেহাদী নয়, এমনকি অনেকেই মৌলবাদী নয়। যদি ৮০ কোটি হিন্দু এবং ১৫ কোটি মুসলমানদের নিয়ে তুলনামূলক বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে প্রায় ৫ শতাংশ হিন্দু দৃঢ়ভাবে হিন্দুত্ব এবং হিন্দু মৌলবাদে বিশ্বাসী। এদের মধ্যে কেবল একটা ক্ষুদ্র অংশ, আনুমানিক ০.০১ শতাংশ চিন্তা করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কথা।

এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে প্রায় ৬০ শতাংশ মুসলমান মৌলবাদী, ৩৫ শতাংশ বিশ্বাস করে ইসলামের পুনরুত্থান, ৩০ শতাংশ বিশ্বাস করে বিচ্ছিন্নতাবাদে। আর পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী উগ্রপন্থী প্রদর্শিত পন্থায় সশস্ত্র জেহাদের মাধ্যমেই ভারতে ইসলামী গৌরব ফিরিয়ে আনাতে বিশ্বাস রাখে প্রায় ১৫ শতাংশ ভারতীয় মুসলমান। এই সংখ্যাতত্ত্ব খুবই উদ্বেগজনক। সংখ্যালঘু পৃথকতাবাদ এনে দেয় বিচ্ছিন্নতাবাদ। এর ফলে হিন্দুদের মধ্যেও সংখ্যাগুরুত্ববাদ ধীরে ধীরে সংঘর্ষের পর্যায়ে গড়াচ্ছে। এদিকে সাচার কমিটির সংখ্যালঘু-অনুকূল রিপোর্টের ভিত্তিতে মুসলিম ক্ষোভ প্রশমনের সরকারী প্রচেষ্টা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। এই ঝোঁকটা বিঘটনকারী। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির উচিত অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টিপাত করা। কারণ এই প্রবণতাকে যদি অনির্দিষ্টকাল বাড়তে দেওয়া হয় এবং সংখ্যালঘুবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় আর সেটা যদি আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যায় যে সংখ্যাগুরুদের ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, তাহলে এক বড় রকমের বিভেদ এমনভাবে এসে পড়তে পারে যাতে বুদ্ধিবাদী চিন্তাধারা বিপন্ন হয়ে পড়বে। জেহাদ তত্ত্ব এবং তার অনুশীলন যে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিক্ষিপ্তভাবে তার প্রদর্শন হচ্ছে তা তো চোখেই পড়ছে। তবে তা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা হচ্ছে না আর খোলাখুলি আলোচনা তো নৈব নৈব চ। গোয়েন্দা বিভাগের পর্যবেক্ষণে যে চিত্র পাওয়া যায় সেটি খুবই উদ্বেগজনক। সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মুসলিম পকেট বা এলাকা যেগুলি আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত ও দূষিত হয়। তালিবানীয় ধ্যান-ধারণা এবং আল কায়দা টাইপের কর্মপন্থা দারুল হারব (ইসলাম বিরোধী শত্রু দেশ) হিন্দুস্থানে বেড়ে চলেছে। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তান মদত পুষ্ট, লস্কর-ই-তৈবা, হুজি প্রভৃতি জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন প্রভৃতি সংগঠনগুলি ভারতে বিক্ষিপ্ত খণ্ড যুদ্ধ চালিয়েছে।

এই সমস্ত ঘটনাবলী এবং অপকর্মের প্রেক্ষিতে, বিশেষতঃ পাকিস্তানের সরাসরি প্রত্যক্ষ মদতে পাঞ্জাবের (খলিস্তানী) আন্দোলন এবং কাশ্মীরে লাগাতার প্রক্সি যুদ্ধ সম্পর্কে হিন্দু প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট। আমি এটাকে বলি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার নামে দেশ বিভাজনের পূর্বেকার অবস্থার পুনরাবির্ভাব, আর এটি হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় গতি-সূত্রের নিয়ম মাফিক। সরকারের সংখ্যালঘু সম্পর্কিত নীতিগুলির প্রতি সংখ্যাগুরুদের বীতস্পৃহা পরিষ্কারভাবে এই প্রতিক্রিয়াকেই বুঝিয়ে দিচ্ছে। ১৭১৪ থেকে আজ পর্যন্ত ঘটা ধর্মীয় দাঙ্গাগুলির ইতিহাস এই কঠোর বাস্তবকে প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় ব্যাপারে মিলিজুলি ভারত কখনও ছিল না। প্রকৃত ইতিহাস হল একসাথে বসবাসের আলাদা হাঁড়ির মতো অবস্থান—লিভিং টুগেদার সেপারেটলি সিচুয়েটেড।

[সূত্র ঃ http : //maloykrishnadhar.com, Indian Fault Lines : Perception and Reality]

প্রথম পাতার শেষাংশ

হোটরে দুর্গাপূজা উদ্বোধন .....

জানান। এই আমন্ত্রণে পুজো উদ্বোধন করতে যান হিন্দু সংহতির সভাপতি তপনকুমার ঘোষ।

সেখানে সপ্তমীর সকালে পুজো উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের আগে ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে তথা গ্রামের হিন্দুদের সঙ্গে এক আলোচনায় সম্পূর্ণ ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়। জানা যায় যে জায়গা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি সেই জায়গাটি আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বেই সরকারের কাছ থেকে স্থানীয় এক হিন্দু কিনে নেন। জায়গাটির দলিল এখনও ঐ হিন্দুর নামেই আছে এবং তিনি সরকারকে এখনও খাজনা দিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় কি করে জায়গাটি কবরস্থান হতে পারে? আর ইসলাম মতে কোন ব্যক্তির নিজের নামে জায়গা কখনও ইসলামিক ধর্মীয়স্থান হতে পারে না। এ বিষয়ে বি.এল.আর.ও. অফিসে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা বলা হয়। পরে ফিতে কাটার মাধ্যমে পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তপন কুমার ঘোষ। উপস্থিত স্থানীয় হিন্দুদের সামনে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণও হয়। সেখানে তিনি দুর্গাপূজার তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'ভগবান শ্রী রামচন্দ্র রাবণকে বধ করার জন্য দেবীর অকালবোধন করেছিলেন, সেটাই আজকের দুর্গাপূজা। মা দুর্গা শক্তির প্রতীক। তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র। আর আজ দিকে দিকে বিধর্মীদের দ্বারা হিন্দুরা আক্রান্ত, তাদের দেবদেবী আক্রান্ত, মা-বোনেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। তাই হিন্দুদেরও শক্তির আরাধনা করে তাদের শক্তিশালী হতে হবে। অষ্টমীর দিন ঘরে ঘরে অস্ত্র পূজাও করতে হবে।' স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে একটা বিশ্বাস ও সাহসের সঞ্চার হয়।

এছাড়া আরও দুটি দুর্গাপূজার উদ্বোধনে শ্রী তপন কুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় রামরাজাতলা স্টেশনে হিন্দু মহাসভার দুর্গাপূজার উদ্বোধন তিনি করেন। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় কলকাতার মল্লিকবাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজার উদ্বোধন করেন পূজ্যপাদ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। এই অনুষ্ঠানেও বক্তব্য রাখেন শ্রী তপন কুমার ঘোষ।

‘সংখ্যালঘু’ ঃ অযৌক্তিক সংজ্ঞার পরিবর্তন চাই

তপন কুমার ঘোষ

ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘুদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য সংবিধানের ২৫ ও ২৬ নং ধারা এবং ৩০ ও ৩০(এ) নং ধারায় বিভিন্ন রক্ষাকবচও দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য খুবই মহৎ, যাতে সংখ্যালঘুদেরকে কোনরকম অত্যাচার বা নিপীড়নের শিকার হতে না হয়। কিন্তু সংখ্যালঘু কারা সেকথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। সংখ্যালঘু বিভিন্ন ধরণের হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ভাষাগত সংখ্যালঘু, জাতিগত (Ethnic) সংখ্যালঘু প্রভৃতি। যেমন বিহার ও ঝাড়খণ্ডে বাঙালিরা ভাষাগত সংখ্যালঘু, আবার পশ্চিমবঙ্গে নেপালি ও হিন্দিভাষীরা ভাষাগত সংখ্যালঘু।

কিন্তু মজার ঘটনা হল ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ক্ষেত্রে। সংবিধানে স্পষ্ট করে কিছু বলা না থাকলেও সেই ১৯৪৭ সাল থেকে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে ভারতে মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা সংখ্যালঘু এবং হিন্দুরা সংখ্যাগুরু। সুতরাং সংখ্যালঘুদের জন্য যাবতীয় সুযোগসুবিধা ও বিশেষ অধিকার পাবে মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা এবং তার দায় বহন করতে হবে হিন্দুদেরকে, কারণ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। যেমন হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ট্যাক্স দিতে হবে, ট্রেনভাড়ায় সারচার্জ দিতে হবে। আর সেই টাকা দিয়ে মুসলমানের হজ যাত্রায় বছরে ১৫০ কোটি টাকা, মাথাপিছু ২২ হাজার টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার অপরাধে হিন্দুর মন্দির অধিগ্রহণ করে তার রোজগার সরকার নিজ পকেটে পুরে সেই টাকায় গীর্জার সংস্কার ও ইমামদের মাইনে দেওয়া হবে। আইনের গঠনে ও সরকারের আচরণে এ দেশের হিন্দুদের একথা মনে হতে বাধ্য যে এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে জন্মগ্রহণ করাটা অভিশাপ। সংখ্যালঘুদের জন্য শুধু আর্থিক দানছত্রই নয়, তাদেরকে এমন বিশেষ বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে যে এদেশের প্রায় সব সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। এই প্রবণতা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ যিনি সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন— ‘আমি নিজেকে হিন্দু বলিতে গর্ব অনুভব করি’, তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনও কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিল যে তাদেরকে সংখ্যালঘুর স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারে তাদের সেই আবেদন নাকচ হয়ে যায়। না হলে এতদিনে রামকৃষ্ণ মিশন অহিন্দু হয়ে যেত।

সংখ্যালঘুদের জন্য এই সকল বিশেষ সুযোগসুবিধা ও বিশেষ অধিকার—তাদের রক্ষা ও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। এতে কোন অন্যায় নেই, এটাই মানবিক। বিশ্বের যে কোন সভ্য দেশই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দিকে এটুকু নজর রাখে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এখন একটু রিয়ালিটি চেক করা যাক। নাগাল্যাণ্ড রাজ্যে খ্রীষ্টানরা জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ। হিন্দু ৫ শতাংশ, অন্যান্য ৫ শতাংশ। এই নাগাল্যাণ্ডে কি খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতা কোনভাবে বিপন্ন হওয়ার আশংকা আছে? স্পষ্টতই নেই। বরং সেখানে যারা হিন্দু বা অখ্রীষ্টান, তাদেরই ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশংকা। তবু সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য নির্ধারিত সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও অধিকার খ্রীষ্টানরাই পাবে, হিন্দুরা ও অন্যান্যরা পাবে না। অনুরূপভাবে মিজোরামে খ্রীষ্টানরা ৮৭ শতাংশ। তবুও খ্রীষ্টানরাই সেখানে সংখ্যালঘু, আর হিন্দুরা সংখ্যাগুরু। অর্থাৎ আমাদের দেশের সংবিধান অঙ্ককেও ফেল করিয়ে দিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে মুসলিমরা ৭১ শতাংশ, হিন্দুরা ২৭ শতাংশ, বৌদ্ধ ১ শতাংশ। তবু সেখানে মুসলিমরাই সংখ্যালঘুর মর্যাদাপ্রাপ্ত। হিন্দু ও বৌদ্ধরা দুয়োরাণীর সন্তান।

শুধু এই রাজ্যওয়ারী চিত্রটাই সব নয়। আসাম রাজ্যে এখনও হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু সেখানে ধুবড়ি জেলায় মুসলমানরা ৭৪ শতাংশ, হিন্দুরা ২৫ শতাংশ। বিহারের কিষণগঞ্জে মুসলিমরা ৬৮ শতাংশ, হিন্দু ৩১ শতাংশ। এই জেলাগুলিতে যে কেউ গেলেই দেখতে পাবেন যে কাদের ধর্মীয় অধিকার সেখানে বিপন্ন। সকলেই জানে যে হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকার, এমনকি অস্তিত্ব রক্ষা করাটাই সেখানে কত কঠিন। তবু সেখানে সংখ্যালঘুর যাবতীয় সুযোগ সুবিধার অধিকারী মুসলিমরা, হিন্দুরা নয়।

জেলাভিত্তিক হিসাবেই এই বৈপরীত্যের শেষ নয়। উদাহরণ নেওয়া যাক পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার। এই জেলায় হিন্দুরা এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এই জেলার ভাঙ্গড় ১ ও ২ নং ব্লকে মুসলিমরা ৬৭ শতাংশ, হিন্দু ৩৩ শতাংশ। এই ব্লকের বহু গ্রামে হিন্দুরা প্রকাশ্যে পূজা অর্চনা করতে পারে না। হিন্দু মেয়েরা যখন তখন অপহৃত ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। বহু গ্রামে তাদেরকে (শুধু হিন্দুদেরকে) গুণ্ডা ট্যাক্স দিয়ে বাঁচতে হয়। বহু হিন্দু এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে। তবু আমাদের সংবিধান ও সরকারের নীতি অনুযায়ী সেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং কোনরকম নিরাপত্তা ও রক্ষাকবচের অধিকারী নয়।

এইভাবে আজ পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে ১০টি জেলাতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়েও কোনরকম সুরক্ষার দাবী করতে পারে না। আর যদি ব্লকের হিসাব করা হয়, তাহলে শুধু এই দুটি রাজ্যে ১২০টিরও অধিক ব্লকে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন। সংবিধানের এই অদ্ভুত বিধান এবং সরকারের আচরণ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একাংশকে দ্রুত ইসলামীকরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের মেঘালয়, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের খ্রীষ্টানীকরণ তো হয়েই গিয়েছে। এখন মণিপুর, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশের খ্রীষ্টানীকরণ দ্রুত চলছে। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের তিনটি ক্ষেত্র ঃ কাশ্মীর উপত্যকা, জম্মু এবং লাদাখ। এর মধ্যে জম্মু হিন্দুপ্রধান। কিন্তু সেই জম্মুর ৬টি জেলার মধ্যেও ৩টিতে হিন্দুরা যথাক্রমে ৪০ শতাংশ (ডোডা), ৩৫ শতাংশ (রাজৌরী) ও ৮ শতাংশ (পুঞ্চ)। এই তিনটি জেলাই দ্রুত হিন্দুশূন্য হয়ে যাচ্ছে। তবু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ—কোন নিরাপত্তা কবচের অধিকারী নয়।

সারা দেশের এই একই চিত্র। তাই আমরা হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে দাবী করছি---সংবিধানের এই বৈপরীত্য সমাপ্ত করা হোক। ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা ও অবধারণা পরিবর্তন করা হোক। সংখ্যালঘুর সংজ্ঞাকে যুক্তিসঙ্গত ও যুক্তিসম্মত করা হোক।

আমাদের দাবী---সারা দেশে জাতীয় ভিত্তিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্ধারণের অযৌক্তিক প্রথা বাতিল করা হোক। সারা দেশে সংখ্যালঘু নির্ধারণ করতে হবে ব্লক ভিত্তিতে। অর্থাৎ প্রতিটি জেলায় যে ব্লকে যে সম্প্রদায় সংখ্যালঘু, সেই সম্প্রদায়কে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও রক্ষাকবচ দিতে হবে। নাহলে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা/অধিকার ও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। ব্লকভিত্তিক সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু নির্ধারণের এই দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তবোচিত। অন্যথায় ভারতবর্ষ তথা হিন্দুস্থানে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব লোপ পাবে। আমাদের দাবী, অবিলম্বে সংবিধান সংশোধন করে সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা পরিবর্তন করে সংখ্যালঘু তোষণের ভোট রাজনীতির ধ্বংসাত্মক খেলা বন্ধ করা হোক। আমাদের এই দাবীকে সর্বস্তরে সমর্থন করে দেশকে বাঁচান—এই আমাদের আবেদন।

চণ্ডীতলায় প্রতিমা বিসর্জনে মুসলিমদের বাধা

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা ব্লক ১ এর উত্তর দুধকল্মী বারোয়ারী দুর্গাপূজা ৯১ বছরের। বরাবরের প্রথা অনুযায়ী দশমীর দিনই আলোবাজনা সহ প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য শোভাযাত্রা বের হয়।

কিন্তু বাদ সাধে এ বছর ২৮ তারিখ সোমবার সন্ধ্যা প্রায় ৬.৪০ নাগাদ যখন শোভাযাত্রা পাকিরাপাড়ার দিকে আসে। পথে চককৃষ্ণরামপুর মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা যেতে দেবে না। তাই এরম এর বাড়ির সামনে কয়েকশ মুসলিম জড়ো হয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ে। যারা সকলেই নবাবপুর অঞ্চলের চককৃষ্ণরামপুর-এর বাসিন্দা। যারা নেতৃত্বে ছিল তারা হল ইয়াকুব, মুজিবর, সেলিম/সুকুর, আমিরুল, গোলাম হোসেন, ফারুক, রহমত, রফিক, রিজায়ুল, ইব্রাহিম। এরা সকলে রাস্তায় শুয়ে শোভাযাত্রা আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু চণ্ডীতলা থানার পুলিশের সহযোগিতায় প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন হয়। পরে বি.ডি.ও.-র অফিসে প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, হিন্দু সংহতির কর্মী তথা মুসলিমদের মধ্যে একটা আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যাতে পরবর্তীতে আর কোনও বাধা না আসে।

হিন্দু সংহতি একা নয়

বাংলার হিন্দু সংহতির মতই দেশজুড়ে একই উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে নানা রাজ্যে বহু সংগঠন। গত ১৯ ও ২০ শে সেপ্টেম্বর এইসব সংগঠনের এক সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়ে গেল দিল্লীতে। সেখানে উপস্থিত এরকমই একটি সংগঠন তামিলনাড়ুর ‘হিন্দু মাক্কাল কাচি’ বা ‘হিন্দু পিপলস্ পার্টি’। ১৯৯৩ সালে এর প্রতিষ্ঠা। সভাপতি ৪৩ বছরের শ্রী অর্জুন সম্পত। ইতিমধ্যেই এই সংগঠন তিনহাজার ধর্মান্তরিত হিন্দুদের আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে এনেছে, ৪টি অ্যাম্বুলেন্স ও ১৭১টি বিনা বেতনের কোচিং সেন্টার খুলে জনসাধারণের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। কিন্তু এদের মূল কাজ জেহাদিদের প্রতিরোধ। এর জন্য তামিলনাড়ুর ২৭টি জেলায় ২০০০ যুবক সবসময় প্রস্তুত থাকে। ১৯৯৮ সালে ৭টি মানববোমা ও ১৩টি স্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোয়েম্বাটুরে আদাবানীকে হত্যার যে চক্রান্ত করা হয়েছিল, পুলিশকে খবর দিয়ে এরাই সেটি ব্যর্থ করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেজন্য পুরস্কারও মিলেছিল। সভাপতি অর্জুন সম্পত সহ ১৮ জন কর্মীকে N.S.A. আইনে সাড়ে তিন বছর কারাগারে আটক রাখা হয়। মুসলিম সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পথসভা, রামায়ণ গানের আসর বসিয়ে জনচেতনা ও ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রামের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এই সংগঠন।

সর্বভারতীয় স্তরে হিন্দু সংহতির কদর

স্বাধীনতার পর অধিকার পেয়ে আমরা আমাদের মত করে পথ চলতে শুরু করেছিলাম। ৬২ বছর চলার পর পথে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবতে হচ্ছে—এ আমরা কোথায় পৌঁছেছি। কোথায় পৌঁছাতে চাই তাও আমাদের অজানা। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় শুধু রাজনৈতিক দলের পালাবদল হলেই চলবে না, যে ব্যবস্থায় ভ্রষ্টাচার, দারিদ্রতা, ঘুষ ও সমাজের কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর ধন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে আর সমাজের প্রতিটি নাগরিকের সমান বিচার পাওয়ার আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে সেই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন চাই। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দ ও ধর্মীয় জগতের বরেণ্য সাধুসন্তেরা এই বিষয়ে এক সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন গাজিয়াবাদে গত ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর। লক্ষ্য ভারতের প্রতিটি গ্রামে ও শহরে চলতি ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে জনসাধারণের নেতৃত্বেই জনজাগরণ ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া। সর্বভারতীয় এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে শ্রী তপন ঘোষ ও হিন্দু সংহতিকে শুধু সাদর আমন্ত্রণ জানানোই নয়, সম্মেলন মঞ্চ থেকে বাংলায় হিন্দু সংহতির কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে শ্রী তপন ঘোষকে সর্বভারতীয় এই উদ্যোগে ভারতের চার রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বও দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে হিন্দু সংহতির তপন ঘোষ ছাড়াও শ্রী চিত্তরঞ্জন দে ও শ্রী অমল বসু অংশগ্রহণ করেন।

পাকিস্তানের এজেন্ট ভারত সরকার

দিল্লিতে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং ডঃ মনমোহন সিং উভয় সরকারই পাকিস্তানের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছে। আমাদের দেশের গোয়েন্দা বিভাগ আই.এস.আই.-এর চর বা এজেন্ট খুঁজে বের করার জন্য কত চেষ্টা করে, কত টাকা খরচ করে। কিন্তু এই দুইজন ব্যক্তি যে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে পাকিস্তানের পাক্কা এজেন্টের মত পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার কাজ করেছেন ও করে চলেছেন তা কারও নজরে পড়ে না।

১৯৯৮ সালে কার্গিল যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধে ভারত জিতেছে। টিভিতে সেই যুদ্ধের ব্যাপক প্রচার করে বাজপেয়ী সরকার দ্বিতীয়বার বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধে ভারতের প্রথম শহীদ লেফটেন্যান্ট সৌরভ কালিয়া এবং তার সাথী আরও চারজন ভারতীয় সৈন্যের উপরে পাকিস্তানি সেনারা যে নির্মম পাশবিক অত্যাচার করেছিল, সেই তথ্যকে লুকিয়ে রেখেছেন অটলবিহারী বাজপেয়ী ও ডঃ মনমোহন সিং।

গত দশ বছর ধরে লেঃ সৌরভ কালিয়ার পিতা ডঃ নরেন্দ্রকুমার কালিয়া ভারত সরকারের কাছে বার বার আবেদন করেছেন যে, তাঁর পুত্রের মৃতদেহের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তাঁকে দেওয়া হোক। কিন্তু বাজপেয়ী সরকারও সেই রিপোর্ট দেননি, মনমোহন সিং-এর সরকারও সেই রিপোর্ট দেননি। কি স্বার্থ এঁদের? ভারতীয় সেনার উপরে পাকিস্তানের এই পাশবিক অত্যাচারের তথ্যকে এঁরা কেন চাপা দিয়ে রাখতে চান? বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের এই অমানবিক চেহারাটা তুলে ধরতে এঁদের আপত্তি কেন? ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বাজপেয়ী সরকার এই তথ্য গোপন করে রেখেছিল। আর ২০০৪ থেকে আজ পর্যন্ত ডঃ মনমোহন সিং এই তথ্য গোপন করে চলেছেন। এর দ্বারা এঁরা কি পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার কাজ করছেন না?

দীর্ঘ দশ বছর ধরে চেষ্টা করেও পুত্রের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হাতে না পেয়ে অবশেষে ডঃ নরেন্দ্রকুমার কালিয়া আর.টি.আই. অ্যাক্টে তথ্য জানার অধিকার আইন অনুসারে ভারত সরকারের কাছে ওই রিপোর্ট দাবী করেছেন। বাজপেয়ী ও মনমোহন সিংদের এই আচরণের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কি?

[সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৬/৯/০৯]

লেঃ সৌরভ কালিয়ার পিতার আবেদন

লেঃ সৌরভ কালিয়ার পিতা ডঃ নরেন্দ্রকুমার কালিয়া দেশবাসীর প্রতি একটি আবেদনে বলেছেন ঃ—

“লেঃ সৌরভ কালিয়া মাত্র ২২ বছর বয়সে জম্মু ও কাশ্মীরের কার্গিল সীমা রক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। তার এই অল্পবয়সে মৃত্যু আমাদের কাছে ও ভারতবাসীর কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা হারিয়েছি আমাদের এক সমর্পিত, সৎ ও সাহসী অফিসারকে।

ভারতের সীমার ভিতর পাকিস্তানী সেনা অনুপ্রবেশ প্রথম খুঁজে বের করে সৌরভ ও তার সাথী পাঁচজন ভারতীয় সেনা। ১৯৯৯ সালের ১৫ মে তারা ঐ শয়তান নাপাক গুলোকে খুঁজতে গিয়ে পাকিস্তানী সেনার হাতে ধরা পড়ে যায়। LOC–র ভারতের দিক থেকেই তাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে তিন সপ্তাহ ধরে পাকিস্তানী সেনারা তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। ৯ জুন ১৯৯৯ তাদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে ফিরিয়ে দেয়। ঐ মৃতদেহগুলির বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে সহজেই বোঝা গিয়েছিল যে তিন সপ্তাহ ধরে ঐ ভারতীয় সেনা অফিসারদের উপর কি পাশবিক অত্যাচার চলেছে। তাদের গোটা শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে, গরম লোহার শিক তাদের কানে ঢোকানো হয়েছে, তাদের চোখের মণিগুলি খুঁচিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাদের শরীরের বেশীরভাগ হাড় ও দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এমন কি তাদের পুরুষাঙ্গ কেটে নিয়েছে এবং হাত ও পায়ে যথেচ্ছভাবে কোপানো হয়েছে।

২২ দিন ধরে এই অকল্পনীয় অত্যাচারের পর তাদেরকে গুলি করে হত্যা করেছে মানবসভ্যতার কলঙ্ক ওই পাকিস্তানী সৈন্যরা।

এত অত্যাচারেও আমাদের সেনাদের মনোবল ওই নরপশুরা ভাঙতে পারেনি, তাদের মুখ দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন গোপন তথ্য তারা বের করে পারেনি। এর থেকে এই শহীদদের যে শৌর্য্য, বীর্য্য, দেশপ্রেম, সঙ্কল্প ও সহ্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং প্রতিটি ভারতবাসী গর্ব অনুভব করতে পারে। কিন্তু আমার আশঙ্কা, পাকিস্তান যেভাবে সমস্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে ভারতকে এইভাবে অপমান করল তাতে আগামীদিনে যে কোন ভারতীয় পিতামাতা তাদের সন্তানকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পাঠাতে শঙ্কিত হবে। পাকিস্তানের হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের রক্ষায় যদি আমরা ব্যর্থ হই এবং তাদের সকলকেই যদি লেঃ সৌরভ কালিয়ার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে তা দেশের সীমা রক্ষায় যুদ্ধরত ভারতীয় সেনার মনোবলও ভেঙে দেবে।

আর একটা বিষয়ও অত্যন্ত লজ্জার ও দুঃখের যে, কোন ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠন এ বিষয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না।

এতে প্রশ্ন জাগে, এই তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠনগুলি আসলে কার স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করে?

আমি এই পত্রের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সমস্ত সভ্য মানুষের কাছে বিনীত আবেদন জানাতে চাই যে, সকলে এই বিষয়টা নিয়ে নিজের বিবেক মন্থন করুন এবং এটাকে একটি ‘জাতীয় বিষয়’ (National Issue) হিসাবে গণ্য করুন। সবাই মিলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করুন যাতে ওই সংগঠনগুলি পাকিস্তানের এই অমানবিক আচরণকে বিশ্ব সমক্ষে তুলে ধরে এবং পাকিস্তান সরকারকে চাপ দেয় যাতে এই অমানবিক অত্যাচারের অপরাধী নরপশুগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের বিচার করে ও শাস্তি দেয়।

যদি পাকিস্তানকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এর পরিণাম ভারতের পক্ষে সুদূরপ্রসারীভাবে চরম ক্ষতিকর হবে।

বিনীত—ডঃ এন. কে. কালিয়া
সৌরভনগর,পালমপুর,এইচ.পি.-১৭৬০৬১
ফোন ঃ ০১৮৯৪-২৩২০৬৫

এই ঠিকানায় শহীদ সৌরভ কালিয়ার বিধবা পত্নী শ্রীমতি নীহারিকা কালিয়া এবং দুই পুত্র সন্তান পার্থসারথি ও ব্যোমেশ বসবাস করছেন।

ভাঙড় থানার সুন্দিয়া গ্রামের হিন্দুদের করুণ আবেদন

To The S.D.P.O
Baruipur
24 P.G.S (S)

বিষয় :- তপশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দুদের উপর দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলিম অত্যাচারের বিবরণ ও প্রতিকার।

মহাশয়,
আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড় থানার সুন্দিয়া ও অশ্বত্থবেড়িয়া গ্রামের স্থায়ী তপশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত গ্রামবাসি, আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ - সুন্দিয়া থেকে - 1½ কি.মি. দূরে অবস্থিত শকুন্তলা গ্রাম, ২ কি.মি. দূরে অবস্থিত অশ্বত্থ বেড়িয়ার মুসলিম পাড়া, ২½ কি.মি. দূরে অবস্থিত বিবেকবাঈট ও কালের আঈট গ্রামের মধ্যে, বিশেষত শকুন্তলা ও অশ্বত্থবেড়িয়া গ্রামের কিছু মুসলিম দ্বারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে অত্যাচারিত।

সুন্দিয়ার হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ভাবাবেগে ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত হেনে, সুন্দিয়ার স্থানীয় হিন্দু গ্রামবাসিদের বাধ্য করে, ভয়ভীতি দেখিয়ে, সুন্দিয়ায় সন্ত্রাস ও আগ্রাসন চালাচ্ছে - কিছু মুসলিম মৌলবাদি, মুসলিম জেহাদের মদতে, সুন্দিয়ার মোড়-মাঠে, জুয়া, মদ, গাঁজার, আখড়া খুলে দৈনন্দিন হচ্ছে, সন্ধ্যার পর পথচলতি হিন্দু নারী পুরুষ আক্রান্ত হচ্ছে, ছিনতাই হচ্ছে। আমরা হিন্দুরা বহুবার (বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিখিত ভাবে ৮ বার) প্রশাসনকে জানিয়েও কোন স্থায়ী সমাধান আজও হয়নি, বরং দিনের পর দিন দুষ্কর্ম বেড়ে চলেছে।

গত ৩০/১২/২০০৬ তারিখে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে - হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষ বসে, নেওয়া একটি সিদ্ধান্তকে অমান্য করে, আমাদের সঙ্গে কোন আলোচনা না করে, হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে, সম্পূর্ণ হিন্দুপাড়ার মাঝে অবস্থিত সুন্দিয়া ফুটবল মাঠে, নুতন করে মজলিস (ধর্মসভা) করবার জন্য - ১৭/৩/০৭ তারিখ থেকে বাঁশ পুঁতে স্টেজ তৈরীর কাজ করছে, কতিপয় মুসলিম মিলে।

গত ১০/৯/০৭ তারিখে ৩২ বছরের ও বেশী পুরাতন, সুন্দিয়ার দুর্গা পূজার প্যান্ডেল করতে বাধা দেয় - (i) বেচু ঘরামী পিতা [illegible] গ্রাম-অশ্বত্থবেড়িয়া (ii) আফাজ শেখ পিতা [illegible] ও তার অনেকে, প্যান্ডেলের কর্মীদের মারতে উদ্যত হয় এবং কুরুচিপূর্ণ অসম্মান জনক কথা বলে, তিরিশ বছর ধরে তৈরী পরিমাপের থেকে, কম জোর মাপের প্যান্ডেল করতে বাধ্য করে, এর ফলে মেয়েদের পুষ্পাঞ্জলি দিতে অসুবিধা হলে, প্যান্ডেলের সামনের সাধারণের ব্যবহার্য ফাঁকা জায়গা, একের পর এক দোকান চালা তুলে চক্রান্ত করে আগ্রাসন করছে।

এখন নানাভাবে বিশেষ দিনে পূজার আরতিতে ঢাক বন্ধ, [illegible] মাইক বন্ধ, অথচ সুন্দিয়ায় হিন্দুপাড়ায় জোর করে নির্মিত মসজিদ থেকে সিদ্ধান্ত ও আইনকে অগ্রাহ্য করে রাত তিনটে থেকে মাইকে উচ্চ স্বরে নানা রকম গান আজান চলে, হিন্দুদের ঘুমে ব্যাঘাত করার সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে) গোমাংস বিক্রির চেষ্টা, নানা অজুহাতে হিন্দুদের মারধোর, জাত তুলে গালাগাল, হুমকি, ইত্যাদি শত প্রকার মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালাচ্ছে - কতিপয় মুসলিম যুবক, মুসলিম জেহাদের মদতে।

এমত অবস্থায় আমাদের মত নিম্ন শ্রেণী ভুক্ত হিন্দুদের উপর মুসলিম অত্যাচার বন্ধে - স্থায়ী ব্যবস্থা হোক, বন্ধ হোক ফুটবল মাঠে নুতন করে ধর্মসভার নামে মুসলিম আগ্রাসন, সুন্দিয়ার মাঠে জুয়া, মদ [illegible] দখল মুক্ত করে, [illegible] করে হিন্দুদের নিরাপত্তা দিয়ে, সুন্দিয়ার সাধারণ ব্যবহার্য জায়গা [illegible] ব্যবস্থা করে [illegible] করবেন, তা না হলে [illegible] ভাবে হিন্দুদের ধর্মাচরণের ব্যবস্থা করে [illegible] আমরা জীবন পণ সংগ্রামের পথে যেতে বাধ্য হব।

বিনীত
(সুন্দিয়ার স্থায়ী হিন্দু গ্রামবাসীগণ)
(1) কর্ণধর নস্কর পিতা [illegible] -

তাং ঃ ২৩/৯/২০০৯

এবং ২৮২ জন হিন্দু গ্রামবাসীর স্বাক্ষর

(শ্রী কর্ণধর নস্কর একজন দীর্ঘকালের সি.পি.এম. কর্মী ও প্রাক্তন অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধান।)

সকল পাঠককে জানাই
শুভ দীপাবলীর
অভিনন্দন

তপন কুমার ঘোষ ও নিত্যরঞ্জন দাস রচিত নতুন প্রকাশিত বইটি
ধর্ম – ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ
এছাড়া আরও বিভিন্ন বইগুলি পাঠকদের মনে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছে

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোনঃ২৩৬০-৪৩০৬, মোঃ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
“দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তা-ই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ”

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com